প্রতিধ্বনি the Echo
Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed Indexed International Journal of Humanities & Social Science
Published by: Dept. of Bengali
Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: https://www.thecho.in
ISSN: 2278-5264 (Online)
ISSN: 2321-9319 (Print)

বাংলা নাটকে কাব্যভাষাঃ প্রয়োগের আধুনিকতায়

(মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নির্বাচিত ত্রয়ী অবলম্বনে)

ড. বর্ণালী ভৌমিক (ঘোষ)

Abstract

The diction used in poetry is itself poetic-diction; outwardly it is artistic and inwardly possesses a deep symbolic significance. When any theatre personality himself possesses such quality, that is conscious poetic mind the play (which is an applied field) itself begets an all total different meaning and the play comes closer to a poetic-drama. While analysing the dramas of modern playwright Sri.Mohit Chatterjee we come across such phenomena. Sri.Chatterjee had been writing plays since three decades of 20 th century. All his plays bears the testimony of the fact that his personality was a successful amalgamation of a playwright and a poet. On one hand his dialogues are sharp and artistic, on the other the musical element of a poetic drama is also present, along with the reflection of the society with its fallies and foibles. From linguistic viewpoint the selected trio of Mohit Chatterjee's plays and the analysis of the poetic language in them is the main endeavor of this research paper.

কাব্যে প্রযুক্ত ভাষাই কাব্যভাষা। অর্থাৎ ভাষার বহিরঙ্গের বিষয়টিকে কাব্যভাষা বলা যেতে পারে, যা সুষমামন্ডিত এবং যার মধ্যেই শব্দকে অর্থব্যঞ্জনায় ব্যবহার করে কবি সাহিত্যিকগণ আপন, উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ করেন। কাব্যভাষায় ব্যবহৃত শব্দ তাই আপাত অর্থের মোড়ক ত্যাগ করে ব্যঞ্জনাপূর্ণ হয়ে ওঠে। কবি যখন মৌখিক ভাষার উপর নির্ভর করে, মৌখিক ভাষা থেকে উপাদান সংগ্রহ করে কাব্য রচনা করেন, তখন তার মধ্যে আঞ্চলিক প্রভাব পড়তে বাধ্য। পক্ষান্তরে, অত্যন্ত সচেতনভাবে কবিগণ শব্দভান্ডার থেকেও দেশী বিদেশী শব্দ উপযুক্ত স্থানে ব্যবহার করে কাব্যভাষার অবয়বকে অলংকৃত করে থাকেন। কাব্যভাষা তাই কাব্যে প্রযুক্ত ভাষা – এই সীমাবদ্ধ ভাবনায় ধরা পড়েনা। তবে একথা ঠিক যে, কাব্যভাষার সঙ্গে প্রযুক্ত-ব্যবহারিক ভাষারও তফাৎ রয়েছে – "ভাবের ভাষা হৃদয়ের স্তন্যপান করিয়া, হৃদয়ের সুখদুঃখের দোলায় দুলিয়া মানুষ হইতে থাকে সুতরাং তাহার জীবন আছে, ছাঁচে ঢালিয়া তাহার একটা নির্জীব প্রতিমা নির্মাণ করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহা চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে পারে না, ও হৃদয়ের মধ্যে পাষাণভারের মতো চাপিয়া পড়িয়া থাকে।"[১] ফলতঃ কাব্যভাষার আঙ্গিক বিশ্লেষণে তা আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। কাব্যভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও কবি সাহিত্যিকগণের মৌলিকতা-স্বাতন্ত্রতা ধরা পড়ে। কারণ, কাব্য-সাহিত্য নির্মাণের ক্ষেত্রে কবির পারিবারিক জীবন যেমন প্রভাব বিস্তার করে, ঠিক তেমনি সামাজিক, রাষ্ট্রিক-অর্থনৈতিক জীবনও রচনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে; ব্যক্তিগত মননভাবনাও রচনার প্রেক্ষাপটে কাজ করে বলা যায়, যেহেতুপ্রতি কবিই মানসিক ও সামাজিক দিক থেকে বিষয়বস্তু স্বতন্ত্র স্থানে অবস্থান করেন, ফলে ভিন্ন ভিন্ন বোধও সচেতনতা থেকেই জন্মগ্রহণ করে, বাহ্যিক উপাদান থেকে বিষয়বস্তু গ্রহণের অভীপ্সা। ফলে স্বাভাবিকভাবেই কবিগণ মানসিকতার দিক থেকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণে কাব্যসাহিত্য রচনা করে থাকেন।

কোন নাট্যব্যক্তিত্ব যখন সচেতনশীল কবিমননের অধিকারী হয়, তখন নাটকের প্রয়োগরীতিতে কাব্যভাষা অন্যমাত্রা পায়। আধুনিক মননসচেতন নাট্যকার মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটক বিশ্লেষণে এই ভাবনাই স্পষ্ট হয়। বিংশ শতকের তিনটি দশক জুড়ে নাট্যক্ষেত্রে তার পদচারণা, নাট্যসত্তার সঙ্গে কবিসত্তার সফল বিমিশ্রণে সার্থক তাঁর প্রতিটি নাটক। একদিকে তীক্ষণ সংলাপের কারুকার্য অপরদিকে কাব্যময় সুরমুর্চ্ছনা। একাধিক আধুনিক সমাজের ত্রুটি-বিচ্যুতি, আন্দোলিত তাঁর নাটকের কাব্যসংলাপ। মানুষের হৃদয়জয়ী সংলাপ, বুদ্ধি-বৈদগ্ধতার কাব্যধারায় ধৌত হয়েছে প্রতিনিয়ত তাঁর নাটকে। গান আর ছড়ার বহুমাত্রিক স্তরে উন্নীত নাট্যকারের কাব্যভাষা। নাটকের অন্তর্গত এই সকল কাব্যময় সংলাপের কাব্যভাষা আধুনিক ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণে নিসন্দেহেই আলোচনা যোগ্য।

ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নির্বাচিত ত্রয়ী নাটকের কাব্যভাষা বিশ্লেষণের প্রথমেই নাটকের ক্ষেত্রে কাব্যভাষার প্রাসঙ্গিকতা আলোচনা প্রয়োজন। নাটক হল দৃশ্যমাধ্যম; সংলাপ সেখানে নাট্যচরিত্র ও দর্শকের মধ্যেকার সেতুবন্ধন করে। দীর্ঘ-দুর্জ্ঞেয় সংলাপ ভারাক্রান্ত করে যেমন নাট্যগতিকে; ঠিক তেমনিই বিপরীতে ছন্দ-সুর, ধ্বনি, শব্দ মাধুর্যতা সহজেই দর্শকমনকে আকৃষ্ট করে। দর্শকের চাহিদা ও নাট্যকারের ভাবাদর্শ তাই বহন করে প্রাসঙ্গিক কাব্যসংলাপ। সামাজিক জীবনে নাট্যকারের সত্যবচন, দায়দায়িত্ববোধের প্রতীক হয়ে উঠে তাই কাব্যময় সংলাপের নাট্যভাষা। এভাষার ব্যঞ্জনা তাই দেশ-কালের নিরিখে কালজয়ী হয়ে ওঠে। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটকের কাব্যময় সংলাপ গুলি এরকমই। সামাজিক-রাজনৈতিক-রাষ্ট্রিক চেতনার মানদন্ডে সেগুলি আজও ঐতিহ্যশালী। এক্ষেত্রে, তাই নাট্যকারের নির্বাচিত ত্রয়ী নাটকের আলোকে আধুনিক গবেষকের দৃষ্টিভঙ্গীতে, ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণে কাব্যময় সংলাপের নাট্যভাষা বিশ্লেষণ করা হবে।

নাট্যক্ষেত্রে কাব্যভাষার প্রয়োগ নাট্যকারের মৌলিক চেতনার ফসল, বৃহৎ দৃষ্টিকোণে একটি কাল থেকে পরবর্তী কাল, একটি যুগ থেকে পরবর্তী যুগ কিংবা এক দশক-শতক থেকে পরবর্তী দশক-শতক এর নাট্যকারের সত্তায়ও পরিবর্তিত ভাষা প্রভাব বিস্তার করে বলে সময়ানুসারে কাব্যভাষা পরিবর্তিত হয়ে যায়। তাই নাট্যক্ষেত্রে পরিবর্তনশীল কাব্যভাষা একাধারে ঐতিহ্যপূর্ণ হয়েও যুগপরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক কাব্যময় সংলাপে শব্দ ব্যবহার, ভাষাঋণ, প্রচলিত শব্দ, উপভাষার উপাদান, সর্বোপরি ব্যঞ্জনা-প্রতীকময়তা কাব্যভাষার চারুত্ব দান করে। সেই কারণেই হয়ত বলা যায় মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নির্বাচিত নাটকত্রয়ের কাব্যভাষায় ছিল অন্তর্নিহিত আবেগ; যাতে সীমাবদ্ধ ছন্দের ব্যবহার রসগর্ভ বাক্য সৃষ্টি হয়ে দর্শক মনকে দুলিয়েছে। রসের উৎস্রোত ঘটেছে। কাব্যভাষা বিষয়টিকে গ্রহণ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'সাহিত্যের স্বরূপ' প্রবন্ধে বলেছেনঃ "কাব্যভাষার একটা ওজন আছে, সংযম আছে; তাকেই বলে ছন্দ। গদ্যের বাছবিচার নেই, সে চলে বুক ফুলিয়ে, সেইজন্যই রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি প্রাত্যাহিক ব্যাপার প্রাঞ্জল গদ্যে লেখা চলতে পারে। কিন্তু গদ্যকে কাব্যের প্রবর্তনায় শিল্পিত করা যায়। তখন সেই কাব্যের গতিতে এমন কিছু প্রকাশ পায় যা গদ্যের প্রাত্যহিক ব্যবহারের অতীত।"[২]

শুধুমাত্র চলিষ্ণু ভাষার পরিবর্তনশীলতার উপর নির্ভর করেই নাটকে কাব্যভাষা বদলে যায় না, একটা কালের সামাজিক-রাজনৈতিক-ঐতিহাসিক পটভূমিও কাব্যভাষা পরিবর্তনের জন্য দায়ী। যেমন মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটকে দেখা গেছে যে - অসহযোগ, বঙ্গভঙ্গ, সন্ত্রাসবাদী ঘটনা, প্রথম-দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ভারতছাড়ো আন্দোলন, মার্কসবাদী ভাবনা, গণতান্ত্রিক ভাবধারা, দ্বি-খন্ডিত রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা ইত্যাদি প্রভাব বিস্তার করেছে। ফলে কাব্যভাষায় নবদিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। তাই কাব্যভাষার চলিষ্ণু শক্তিকে তিনি যথাযোগ্য নাট্যসংলাপে প্রয়োগ করেছেন। আবেগ প্রবণ নাট্যকার কাব্যভাষার রূপ নির্মাণের ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবেই মৌখিকভাষাকে সংলাপে চয়ন করেছেন। বাকরীতি এবং কাব্যরীতির সমন্বয়ে গড়ে ওঠা কাব্যভাষা মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটকে অন্যমাত্রা পেয়েছে।

আধুনিক নাট্যকারদের মধ্যে অন্যতম, কিছুটা ভিন্নতর বলা যায় মোহিত চট্টোপাধ্যায়কে শব্দ নিয়ে জাগলিং করে, শব্দজাদুতে দর্শক মনকে মোহিত করেতন তিনি। প্রয়োগরীতি তাই তাঁর নাটকে মৌলিক। কাব্যময়তায় পরিপূর্ণ তাঁর নাটকের সংলাপ, পূর্ণাঙ্গ নাটকের সংখ্যা প্রায় ২৪টি, একাঙ্ক ১১টি; সমান্তরালে কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা ৪-টি, উপন্যাস তিনটি। এছাড়াও চিত্র পরিচালক মৃণাল সেনের সঙ্গে একাধিক ছবির চিত্রকাহিনী ও চিত্রনাট্য, অসংখ্য বেতার নাটক, দূরদর্শনের চিত্রনাট্যের জনক তিনি। শিশু চলচিত্রের

পরিচালনাও তিনি করেছেন, এই বিপুল রচনা সম্ভারের মধ্যে থেকে তিনটি নাটককে – 'স্বদেশী নক্‌শা', 'কানামাছি খেলা' ও 'তোতারাম', নির্বাচন করে, ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণে এগুলির কাব্যভাষা বিশ্লেষণ করা হল।

'স্বদেশী নক্‌শা' নাটকটির অভ্যন্তরে শ্রেণীস্বার্থের প্রকটতা দেখাতে চেয়েছেন নাট্যকার। সূচনায় খুব সহজভাবে অশ্বমেধ ঘোড়া নিয়ে জকির খেলা ও কাব্যময় সংলাপের মধ্যে দিয়ে রাজনৈতিক অবস্থাকে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন নাট্যকার। সহজ সরল ভাষা হলেও তোক্ষণ-শাণিত উক্তির মধ্যে ধরা পড়েছে রাষ্ট্রিক ত্রুটি-বিচ্যুত, ক্ষমতা-শক্তি দখলের উল্লাস, ঔপনিবেশিক উচাটনের সক্রিয় রাজনীতি। তাই ঘুঙুর পায়ে সঙের গানেই উঠে এসেছে তৎসম, অর্ধতৎসম, দেশী, বিদেশী, আঞ্চলিক শব্দের বাহার ---

"স্বাধীনতা আন্দোলন গল্প ফেঁদেছি।
জাতটা নিয়ে বজ্জাতির এক নক্‌শা রচেছি।।
দেশের কথা দশের কথা বলবো সোজাসুজি।
দেখুন বসে ভন্ডগুলার নানান কারসাজি।।
ঘরশত্তুরের গুষ্টি যত রেগে হবেন টং।
সঙের সঙ আজ এক নজরে দেখুন ডডং ডং।।"

জকির সংলাপে উঠে এসেছে বাংলা-ইংরাজির বিমিশ্রণে কৌতুকময় কাব্যভাষা; যেখানে সহজ-বোধগম্য ইংরাজির সাথে দেশী-মৌলিক-প্রচলিত শব্দ অন্ত্যনুপ্রাস অলংকারের সাথে যুক্ত হয়ে ছড়ার ছন্দে বহুমাত্রিক হয়েছে, কোথাও বা পূর্ণোপমা প্রয়োগ করে, তুলনাবাচক শব্দ দিয়ে বাক্য শুরু হয়েছে।

দৃষ্টান্তঃ ১) "যেন মুক্তো ঝরে রাশি রাশি!"

২) "মাই নেইম ইজ হরিদাস পাকড়াশি
অলওয়েজ মুখে হাসি।
ডাকলেও আসি, না ডাকলেও আসি"

৩) "জয় জয় অশ্বমেধের ঘুড়া
ওয়েলকাম, ওয়েলকাম, হিপ্ হিপ্ হুর্‌রা—
জয় জয় অশ্বমেধের ঘুড়া,
কনসাল্ট করুন হিস্ট্রি
পাবেন এনার কীর্তি।"

কাব্যভাষায় ছোট ছোট তুলনা করে, শব্দকে ভেঙ্গে, দর্শকের বোধগম্য করেছেন নাট্যকার ---

"গাছের মধ্যে তুলসী, পাতার মধ্যে পান।
জীবের মধ্যে অশ্বমেধের ঘুড়া ভগবান।"

নাট্যকারের অভিপ্রেত বক্তব্যকে রূপকের আশ্রয়ে সরল বাংলায় সঙ্গীত মাধ্যমে স্বরবৃত্ত ছন্দে উঠে এসেছে। অতিপর্বের বিষয়টিও এক্ষেত্রে লক্ষনীয় ---

"দেশে এখন সাহেব রাজা, তারাও পূজেন ঘুড়া.....
রাজার সাথে পূজায় মাতে নেটিভ বাবুরা।
(আহা) লুটের বাজারে এর মেলে না জোড়া।
জয় জয় অশ্বমেধের ঘুড়া।।"

স্বাধীনতার ঐতিহাসিক সত্যতা উঠে এসেছে কাব্যভাষায়। কখনও দৃঢ় সেই সত্যবচন কখনও নক্‌শা-কৌতুকধর্মী তার বক্তব্য। সাধারণ মানুষের পেটের খিদের যন্ত্রণার বাস্তব চিত্রের পাশাপাশি স্বাধীন ভারতে পেটভরে দুটো খেতে পাওয়ার আনন্দ-স্বপ্ন আকাঙ্কা উঠে এসেছে নাট্য সংলাপে, কাব্যভাষা হয়েছে বিষয়ানুযায়ী; সংকেতধর্মী, ব্যঞ্জনায় পরিপূর্ণ। রাঢ়ী উপভাষার মৌখিক রূপটি স্পষ্ট হয়েছে অনেকক্ষেত্রেই ---

"স্বাধীনতার রব উঠেছে, দেশের মানুষ খাড়া হচ্ছে
আমার জ্বালা ক্ষিদের জ্বালা, স্বাধীনতার মানে হচ্ছে ভাতের থালা
সেটুক পেলেই বাঁচি, দুহাত তুলে নাচি।"

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যভাষায় এমন বেশ কিছু শব্দ, ছন্দ, আবেগ-ভাবনার স্পর্শ পাই, যেগুলি দেখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যকলাকে মনে পড়ে। একই সাথে শব্দ প্রয়োগে কোমলতা, বিদেশী শব্দের ব্যবহার-মাঝে ব্যঞ্জনধ্বনি-স্বরধ্বনি সমন্বয়ে দীর্ঘ সুরতরঙ্গ সৃষ্টি ছন্দে ভিন্নমাত্রা সংযোজন করেছে ---

"আহা রে আহা রে আহা রে আহা রে আহা!
পেয়েছি পরাণ চেয়েছে যাহা।
মন নিকুঞ্জে গাহে পাখি
পিউ কাঁহা, পিউ কাঁহা, পিউ কাঁহা।
ট্রা লা লা লা লা লা লা, ট্রা লা লা লা লা লা লা
লঙ্ লিভ ফিরিঙ্গী বাবা
ষড়ভুজে উঁচু করেছি যে ছয়টি থাবা।"

কিংবা "শ্যাম/তব গৌরবে গরবিনী হাম। / তুমি নেবে রণভেরী/ আমি দেব বাঁশরী/ রঙসে গৌঙাইবো দিন যাম।" কখনও বা মাত্রাবৃত্ত ছন্দের দোলা, কখনও ত্রিপদীর ছন্দে মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদাবলীয় রীতি, কখনও বা ৪-মাত্রার সহজ-সরল ছড়ার ছন্দে কাব্য সংলাপকে প্রসাধন করেছেন নাট্যকার। কাব্যভাষায় কখনও নাট্যকার এমন অভিনব শব্দ সৃষ্টি করেছেন, যা ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণে বৈচিত্র্যপূর্ণ।

যেমন- 'সারস্' - সার (Sir) ইংরাজী শব্দ; এর বহুবচনের রূপ হয়েছে 'সারস্' (অর্থাৎ Sir+S)
'সমঝদারস্' - সমঝদার (হিন্দি শব্দ); একে বহুবচনের রূপ দিতে ইংরাজী 'S' এর পরিবর্তে বাংলায় 'স্' প্রয়োগ করেছেন।

"অল সিটিং মাই ডিয়ার সারস্
ইউ আর ভেরি সমঝদারস্।"

'বটলে' - বটল (Bottle; ইংরাজী শব্দ) + বাংলা 'এ' বিভক্তি যোগে শব্দ সৃষ্টি হয়েছে : "বিদেশী বটলে হাসিচ্ছে"।
'থাটিনঅঘ্রাণ' - থাটিন (ইংরাজী) + অঘ্রাণ (বাংলা)
'পাওয়ারখানা' - পাওয়ার (Power) + খানা (বাংলা)
'সাহেব', 'কৌঁসুলি', 'আদালত', 'সার্কাস', 'জাহান্নাম', 'কউন্সিল', ক্যাবিনেট এই সকল শব্দ অবলীলায় স্থানে পেয়েছে কাব্যভাষায়। বিশেষ করে ইংরাজী শব্দ; কখনও পূর্ণাঙ্গ বাক্য-বাক্যাংশ, কখনও বা টুকরো টুকরো ইংরাজী শব্দ বসিয়ে নাট্যকার সংলাপ চয়ন করেছেন ---

"ও মাই মাদার মেরি-
আই অ্যাম ভেরি স্যরি!
হোয়েন মাই মাদার ডায়েড
লাইক এ বেবি আই ক্রায়েড
উইথ রম অ্যাণ্ড শেরি—
ও মেরি-মাই মাদার মেরি।
আই অ্যাম ভেরি স্যরি।
ও মেরি, মেরি--!"

গীতি বহুল নাটক যেমন 'স্বদেশী নক্শা' তেমনই লোকসঙ্গীতের সুরধারায় আদ্যান্ত স্নাত 'কানামাছি খেলা' নাটকটি। গ্রাম্য লোকজ, সাধারণ শব্দ মাধুর্যতা নাটকটি স্তরে স্তরে। অতি সাধারণ ঘটনা, রূপকের আশ্রয়ে কৌতুক ও কৌতুহলের বিমিশ্রণে উপস্থাপন করা হয়েছে। নাট্যগতি উল্লম্ফন প্রক্রিয়ায় এগিয়েছে। কাব্য সংলাপের কোন কোন শব্দ, বাক্য রূপকের দ্যোতনা এনেছে, একই সাথে তৎসম, অর্ধতৎসম, তদ্ভব, দেশী-বিদেশী শব্দের সমন্বয়ে কাব্যভাষা দর্শকের মনে দোলা দিয়েছে।

দৃষ্টান্ত :

"মাথায় বাড়ে চুলের বোঝা—
হাওয়া লাগে না!
জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে মাথা—
আগুন নেভে না!

এ জ্বালা না জুড়োলে তো
বাঁচা যাবে না!
বাঁচা যাবে না!
বাঁচা যাবে না!"

এক্ষেত্রে, দেখা যাচ্ছে সংলাপ শেষের একটি চরণ ধুয়াপদের মত ব্যবহৃত হয়ে, বাক্যটির উদ্দেশ্য অর্থকে দৃঢ়তর করে তুলেছে। মাত্রাবৃত্ত ছন্দের দোলায়, সহজ-বোধগম্য, শব্দ ব্যবহারে, অন্ত্যনুপ্রাসের স্পর্শে অনেক সংলাপই কৌতুককর হয়েছে ---

"জুড়োলো জুড়োলো আমার
জ্বালা জুড়োলো,
বাজিলো বাজিলো মনে
বীনা বাজিলো।"

রাজা হলেন দেশের শাসক, অধিনায়ক, বিপুল শক্তি-ক্ষমতার অধিকারী; তার অধীনস্থ প্রজাসকল রাজার প্রশাসনিক ও বিচার ক্ষমতার উপর যাতে সর্বদাই আস্থা রাখেন – এমনটাই রাজার ইচ্ছা, তাই সে শব্দ সাজিয়ে রূপকের আশ্রয়ে অতি সাধারণ মৌখিক কাব্যসংলাপে বলে ওঠেন—

"ঘাড়টা ধরে রাজত্বটা না চালালে
তারে কি আর লোকে রাজা বলে!
পায়ের কাছে মাথা না নোয়ালে
রাজত্বটা যায় রসাতলে।
তলোয়ারের ডগা ছাড়া
আর কোন ঠাঁই
এ রাজ্যে নাই ....."

কি অপূর্ব শব্দবন্ধন; বাক্যকে ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে, অর্থাৎ উদ্দেশ্য-বিধেয় সম্বন্ধ একটি বাক্যের কর্তা+কর্ম+ক্রিয়ার অন্বয় ভেঙ্গে ভেঙ্গে শেষে উদ্দেশ্যকে একটি ছোট্ট বাক্যে ধরার ক্ষমতা রেখেছেন নাট্যকার, একই সাথে কাব্যভাষায় গদ্যের কাব্যিক রূপকেও যথাযথ সংরক্ষণ করেছেন ---

"আজ উল্লাসে এই প্রাণ মাতিল
আকাশের চাঁদে হাত পাতিল।"

– এ যেন রবীন্দ্রভাব চেতনার জগতে নাট্যকারের অবাধ বিবরণ। তাইতো 'হৃদয়', 'ত্রিভূবন', 'কুসুম', 'নাচন' শব্দগুলির প্রয়োগ ঘটেছে। 'স্বর্গ', 'সিংহাসন', 'ক্ষিদে', 'ব্যাঘ্র', 'চক্ষু', 'বৃক্ষ' ইত্যাদি তৎসম শব্দের পাশাপাশি 'ঝ্যাঁটা', 'ঝাড়ন', 'মাম্‌দো', 'ছানা', 'চালচুলো', 'কুলো', 'ছাই' ইত্যাদি দেশী শব্দও স্থান পেয়েছে। এসেছে 'সেলাম', 'ডর', 'ফন্দি', 'সন্ধি', কৃতঋণজাত শব্দগুলিও। কোথাও বা শব্দের প্রাকৃত রূপও রক্ষিত হয়েছে যেমন – 'আন্ধার' ('অন্ধকার' কিংবা 'আঁধার' নয়)। চরিত্র অনুযায়ী কাব্যসংলাপের পরিবর্তন যেমন ঘটেছে; তেমনই এই পরিবর্তন এসেছে সমস্ত ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যকে অনুসরণ করেই। তবে অতি সাধারণ শব্দ, বাক্যাংশ, বাক্য রূপকের দ্যোতনা নিয়ে এসেছে। এরকম কিছু দৃষ্টান্ত ---

১) "জীবন অত সস্তা নহে।"
২) "রাজার চুলে হাত ঠেকালে দুঃখু আছে তার কপালে"
৩) পঞ্চজনে দেখো বসে ভূতের ব্যাপারে ছেরাদ্দ।"
৪) "সমান 'বিপদ সবেতে'- এগোনো কি পিছানো।"
৫) "বাইরে রাজা, ভিতরে তার
শিং-উচানো জানোয়ার।"
৬) "শান্তি সুখে বাঁচতে হলে
দে রাজার কান মলে।"

বেশ কিছু কাব্যসংলাপে লোকসঙ্গীতে সুর এসেছে। স্থান পেয়েছে দেশজ-লৌকিক গ্রাম্য শব্দ। এসেছে অতি গ্রাম বাংলায় প্রচলিত উপমা, সংস্কার, রীতি।

"শোনাই শোনাই করিসনে মা
তোর সোনাই যে আর নাই।
চোখে ঠ্যাকা তুলসী পাতা
বিদেয় হয়ে যাই।।
মা তোর আঁচল কেটে পাইলে গেছি
ভবের গেরোয় বাঁধা নাই।"

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের তৃতীয় যে নাটকটির কাব্যসংলাপের ভাষাতাত্ত্বিত বৈশিষ্ট্য আলোচনাযোগ্য, তার কাব্যভাষা অভিনব ও বৈচিত্র্যপূর্ণ; অপরাপর আলোচ্য দুই নাটকের কাব্যভাষার তুলনায় এ ভাষা স্বতন্ত্র। কারণ নাট্যকারের কাব্যিক মন ও চেতনার পূর্ণস্বরূপ ধারণ করে রয়েছে নাটকটির কাব্যভাষা। ভজু চরিত্রটির সংলাপেই তা স্পষ্ট। স্বরবৃত্ত ছন্দে, শ্রুতিমধুর শব্দ ব্যবহারে ভাষার স্বচ্ছন্দতা ও পেলবতা সৃষ্টি করেছে।

"ফাগুন মাসের আগুন এসে মন পোড়াতে লেগেছে
ফুলের কঁড়ি মুচকি হেসে পাপড়িগুলো মেলেছে
মনের সখি দেখ চেয়ে তোর মনচোরা যে এসেছে
মৌচাকেতে মৌ ধরেনা একটুখানি চেয়েছে।"

এক্ষেত্রে, তৃতীয় চরণে 'মনচোরা' শব্দটি লক্ষনীয়; মন চুরি করে যে তাকে 'মনচোর' বলে, এর সাথে 'আ' যুক্ত করে শব্দটিকে অন্য মাত্রা দিয়েছেন। আবার, বেশ কিছু গানে প্রত্যক্ষভাবে দ্বারকার কৃষ্ণ প্রসঙ্গ রূপকের আশ্রয়ে উঠে এসেছে। তবে 'কৃষ্ণ' শব্দটিকে সরাসরি না বসিয়ে কৃষ্ণ> কান্হ> কানাই> কানা> 'কালা' – এভাবে 'কালা' শব্দটিকে বসিয়েছেন; যেখানে উপভাষাগত প্রভাবও কাজ করেছে।

"সেই কালা কি এই কালা
দ্বারকায় যে রাজা হলো মথুরায় সে গোয়ালা
রাখাল ছেলের বেশ খুলে
রাজদন্ত নিল তুলে।
রাজবেশে, সাজে কালা, বনে রইলো বনমালা।"

কোথাও বা কাব্যভাষায় স্থান পেয়েছে স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ জাত শব্দ – "সাগর ছেঁচিয়া আমি মুকতা এনেছি।' নাট্যকার মোহিত চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সৎ, স্বাধীনচেতনা, দৃঢ় ব্যক্তিত্ব মনস্ক প্রবাদপ্রতিম। তাই তাঁর নাটকে অশুভ – অকল্যাণের পরাজয় সর্বত্র ঘোষিত হয়েছে, সমাজের যা কিছু ত্রুটিপূর্ণ-অন্যায়-অবিচার, তা তিনি দায়িত্বসহকারে নাট্যচরিত্রের সংলাপের মধ্যে দিয়ে উপস্থাপনা করে গেছেন নাটকের কাব্যভাষায়। তাই এ ভাষা কখনও দৃঢ়, মজবুত ইস্পাতের মত তীক্ষণ-শানিত; কখনও বা শ্রুতিমধুর-দোলায়িত। কাব্যভাষায় সংযত সত্যতথ্যের পাশাপাশি তৎসম শব্দের আধিক্যতা রূপ-রূপকের আশ্রয়ে ধরা পড়েছে প্রতিনিয়তই। কাব্যভাষার অন্বয়বন্ধনও সংস্কৃতানুসারী কোন কোন স্থান। সাধারণ-বঞ্চিত মানুষের চিন্তা চেতনার মনোজগৎ স্পর্শ করতে পেরেছেন নাট্যকার; তাই অতি সহজেই লিখতে পেরেছেন ---

"শোনরে তোরা জগৎবাসী
লোভের জ্বালা সর্বনাশী!
যে ধন আমি ভালোবাসি—
স্রোতের টানে যায় যে ভাসি।
গেল আলো, চাঁদের হাসি
রইলো দুঃখ, রাশি রাশি।"

জগতে লোভ-রিপু যে দুঃখের সারাৎসার, একথা কত সহজ শব্দের বাঁধনে কবি বেঁধেছেন, কোথাও বা অতিপর্বে শ্বাসাঘাত দিয়ে, স্বরবৃত্ত ছন্দের দোলায়, অন্ত্যানুপ্রাসে দর্শক মনকে ভরিয়েছেন

"(ঠাকুর) তোমার লীলা তোমার খেলা
তোমার ইচ্ছা বোঝা দায়।

(আমায়) যেমন চালাও তেমনি চলি
মাথা রেখে তোমার পায়।।"

এই দার্শনিক উক্তি ব্যঞ্জনায় পরিপূর্ণ। পরিচিত শব্দকে ব্যবহার করে, লৌকিক প্রবচনও এসেছে কোথাও ---

"তপ্ত ভাতে গাওয়া ঘিয়ের গন্ধ উঠেছে
সোনামুগের ডালে মাছের মাথা পড়েছে।"

পরিশেষে, মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নির্বাচিত ত্রয়ী নাটকের কাব্যভাষা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মনে হয়েছে; নাট্যসংলাপের গুণধর্মের সঙ্গে যথার্থ বিমিশ্রণ করতে পেরেছেন তিনি কবিসত্তার। উপযুক্ত ভাব-ভাবনা, চেতনায় তাই রঙ্গিন তার নাটকগুলির কাব্যভাষা। প্রত্যেকটি চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কাব্যভাষার পরিবর্তন সেখানে স্পষ্ট। নাটকের ভাব-বিষয়বস্তুকে কখনও লঘু চপল করতে, কখনও দৃঢ় সংলাপধর্মী বক্তব্যকে উপস্থাপনা করতেই কাব্যভাষা সার্থকতা পেয়েছে। সংস্কৃতানুসারী কাব্যভাষায় বাক্যের অন্বয়বন্ধনে, উদ্দেশ্য-বিধেয় স্পষ্ট, তৎসম-অর্ধতৎসম শব্দ পূর্ণ। তদ্ভব, দেশী-বিদেশী শব্দ দিয়েও বাক্য আকর্ষণীয় হয়েছে। নাট্যভাবনানুযায়ী, ছন্দের পরিবর্তন ঘটেছে। অলংকারের প্রয়োগ ঘটেছে। শব্দ ও বাক্য শ্বাসাঘাতে এর ফলে বাক্যে চারুত্ব রক্ষিত হয়েছে। সর্বোপরি, মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নির্বাচিত ত্রয়ী নাটকের কাব্য সংলাপের কাব্যভাষা সুষমামন্ডিত-অলংকৃত ও যথার্থ; এ বিষয়ে যথেষ্ট গবেষণার অবকাশ রয়েছে।

তথ্যসূত্র :

১) 'রবীন্দ্র রচনাবলী', দশম খন্ড, সমালোচনা, 'বাউলের গান', প্রকাশক :- শিক্ষাসচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, মার্চ ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ৫৬।
২) 'রবীন্দ্র রচনাবলী', দশম খন্ড, 'সাহিত্যের স্বরূপ' প্রকাশক :- শিক্ষাসচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, মার্চ ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ৫৮১।

সহঅধ্যাপিকা ও বিভাগীয় প্রধানা, দশরথ দেব মেমোরিয়্যাল কলেজ (গভঃ), লালছড়া, খোয়াই, ত্রিপুরা।